চতুর্থ অধ্যায়

শূন্যের বরণ

প্রাচ্যে শূন্যের আগমন

অসীমের মাঝেই আছে আনন্দ। সসীমের মাঝে কোনো মজা নেই।

~ ছান্দোগ্য উপনিষদ

পশ্চিমের শূন্যের ভীতির মাঝেও প্রাচ্য শূন্যকে স্বাগত জানায়। ইউরোপে শূন্য ছিল নিগৃহীত। কিন্তু ভারতে ও পরে আরবে শূন্যের বিকাশ ঘটে। শেষবার যখন আমরা শূন্যকে দেখেছি, সেখানে শূন্য ছিল শুধুই একটি স্থানীয় মান। ব্যাবিলনীয় গণনাপদ্ধতিতে শূন্য ছিল একটি ফাঁকা দাগ। শূন্য কিছু কাজে লেগেছিল, কিন্তু নিজে কোনো সংখ্যা ছিল না। এর কোনো মান ছিল না। এর বাঁয়ের অঙ্কগুলোই একে অর্থবহ করে তুলত। নিজে একা থাকলে আক্ষরিকভাবেই এর কোনো অর্থ হত না। ভারতে এসে অবস্থা পাল্টাল।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের কথা। অ্যালেক্সান্ডার দ্য গ্রেট তাঁর পারস্য বাহিনী নিয়ে ব্যাবিলন থেকে ভারতের দিকে অগ্রসর হলেন। এই আগ্রাসনের সময় ভারতীয় গণিতবিদরা প্রথমবারের মতো ব্যাবিলনীয় সংখ্যাপদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে। জানতে পারে শূন্যের কথাও। ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্ব সালে অ্যালেক্সান্ডার মারা যান। পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত জেনারেলরা সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্ব সালে রোম ক্ষমতায় আরোহণ করে। গ্রিস রোমের থাবায় আটকে পড়ে। তবে আলেকজান্ডার যতটা এসেছিলেন, রোমকদের ক্ষমতা ততটা পূর্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। ফলে চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের খ্রিষ্টধর্মের উত্থান ও রোমের পতনের প্রভাব থেকে দূরের ভারত মুক্ত থাকল।

ভারত এরিস্টটলের প্রভাব থেকেও মুক্ত রইল। হ্যাঁ, আলেকজান্ডার এরিস্টটলের শিষ্য ছিলেন। তাঁর দর্শনও অবশ্যই নিয়ে আসেন ভারতে। তবে গ্রিক দর্শন ভারতে কখনোই সেভাবে স্থান করে নিতে পারেনি। গ্রিসের মতো ভারতে অসীম বা শূন্যতা নিয়ে কোনো ভীতি ছিল না। বরং এখানে এ ধারণাকে বরণ করা হয়।

হিন্দু ধর্মে শূন্যতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। হিন্দু ধর্মের সূচনা বহুশ্বেরবাদের ধারণা থেকে। অনেক দিক থেকেই গ্রিক রূপকথার মতো এখানেও যোদ্ধা দেবতাদের গল্প প্রচলিত আছে। তবে আলেকজান্ডারের আগমনের বহু শতাব্দী আগে থেকেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেবতারা একীভূত হতে শুরু করে। হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও দেবতাদের প্রতি ভক্তি অক্ষুন্ন থাকলেও মৌলিকভাবে এটি একেশ্বরবাদী ও অন্তর্বীক্ষণমূলক ধর্ম হয়ে গেছে। সকল দেবতা সর্বদ্রষ্টা ব্রহ্মার বিভিন্ন অংশ হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে। পশ্চিমে গ্রিকদের উত্থানের প্রায় একই সময়ে হিন্দু ধর্ম পশ্চিমা রূপকথার সাথে মিল হারাচ্ছিল। স্বতন্ত্র দেবতাদের ভূমিকা হারিয়ে যাচ্ছিল। আধ্যাত্মিক শক্তি ধর্মটায় অনুভূত হচ্ছিল। সন্দেহ নেই, আধ্যাত্মিকতার উৎস প্রাচ্য।

প্রাচ্যের অনেক ধর্মের মতোই হিন্দু ধর্মে আছে দ্বৈতবাদের কথা। পাশ্চাত্যেও মাঝেমধ্যে এর উদয় ঘটেছিল। তবে এ ধরনের চিন্তাকে একঘরে করে রাখা হয়েছিল। এমন একটি বিপরীত চিন্তা হলো মানিকিজম বা মানি ধর্ম। এখানে বলা হয়, পৃথিবীটা সমান ও বিপরীত পরিমাণ ভালো ও খারাপ দ্বারা প্রভাবিত। দূরপ্রাচ্যের ইন ও ইয়াং এবং নিকটপ্রাচ্যের জরথুস্রের ভালো ও খারাপের মতো সৃষ্টি ও ধ্বংস ছিল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। দেবতা শিব একইসাথে জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংসের নায়ক। ছবিতে দেখানো হয়, তার এক হাতে সৃষ্টির ঢাক, আরেক হাতে ধ্বংসের শিখা। তবে শিব আবার শূন্যতারও প্রতিনিধিত্ব করে। এই দেবতার একটি দিক হলো নিষ্কল শিব। আক্ষ্রিকভাবে এই শিবের অর্থই হলো অংশবিহীন শিব। চূড়ান্ত ভয়েড বা শূন্যতা ও পরম নাথিংনেস। প্রাণহীনতার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। তবে মহাবিশ্বের সৃষ্টিও ভয়েড বা শূন্য থেকে। যেভাবে জন্ম অসীমের। হিন্দু ধর্মে মহাবিশ্ব পাশ্চাত্যের ধারণা থেকে আলাদা ছিল। এখানে মহাবিশ্বের পরিধি অসীম। আমাদের মহাবিশ্ব পেরিয়ে আছে আরও বহু বহু মহাবিশ্ব।

ওদিকে মহাবিশ্ব আবার তার শূন্যতাকেও ভুলে যায়নি। শূন্যতা থেকে মহাবিশ্বের জন্ম। আবার শূন্যতার প্রাপ্তি হয়ে দাঁড়াল মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এক গল্পে মৃত্যু আত্মা সম্পর্কে শিষ্যকে বলছে, “সব প্রাণীর হৃদয়ে লুকায়িত আছে আত্মা, স্বকীয়তা। সবচেয়ে ক্ষুদ্র পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্র, সুবিশাল মহাকাশের চেয়ে বড়।" এ আত্মা বাস করে সব জিনিসের মধ্যে। এ আত্মা মহাবিশ্বের নির্যাসের অংশ। এর নেই মৃত্যু। কেউ মারা গেলে আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হয়। প্রবেশ করে আরেক দেহে।১ আত্মার স্থানান্তরের মাধ্যমে মানুষটার নবজন্ম হয়। হিন্দু ধর্মের উদ্দেশ্য হলো আত্মাকে পুনজন্মের চক্র থেকে পুরোপুরি বের করে আনা। মৃত্যুর প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরে মরা থেকে প্রাণহীনতার মাধ্যমে চূড়ান্ত মুক্তি অর্জনের পথ হলো বাস্তবতার ভ্রম থেকে সরে আসা। দেবতার কথা হলো, “আত্মার বাড়ি দেহ। আনন্দ ও কষ্টের শক্তি একে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ দেহের নিয়ন্ত্রণে থাকলে কখনও মুক্তি পাবে না। মুক্তির জন্য রক্ত-মাংসের চাহিদা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মার শূন্যতা ও নিরবতাকে গ্রহণ করতে হবে। আত্মা তখন মানবিক চাহিদা ত্যাগ করে উড়ে চলে যাবে। যোগ দিবে সম্মিলিত চেতনার সমাবেশে। যে অসীম আত্মা পুরো মহাবিশ্বে বিস্তৃত। একইসাথে যেটা সব জায়গায়, আবার কোথাও না। একইসাথে ইনফিনিটি (অসীম) ও নাথিং। এসব কারণে ভারতীয় সমাজে ভয়েড (শূন্যতা) ও ইনফিনিটির জগতে বিচরণ ছিল। স্বাভাবকভাবেই শূন্যকে তারা গ্রহণ করল।

শূন্যের পুনজন্ম

দেবতাদের একদম সূচনাকালে অস্তিত্বের জন্ম হয় অনস্তিত্ব থেকে।

-ঋগ্বেদ

ভারতীয় গণিতবিদের কাজ শূন্যকে গ্রহণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা এর ভূমিকাও পালতে দিল। প্লেস হোল্ডার থেকে সংখ্যায় রূপান্তর হলো। এই পুনজন্মই শূন্যের শক্তির উৎস। ভারতীয় গণিতের উৎস সময়ের চাদরে ঢাকা। ৪৭৬ সালে রোমের পতনের বছরে লেখা একটি ভারতীয় বইয়ে গ্রিক, মিশরীয় ও গণিতের প্রভাবের কথা জানা যায়। যে প্রভাবের সূচনা অ্যালেকজান্ডার। মিশরীয়দের মতো ভারতীয়রা দড়ি দিয়ে জমির হিসাব ও মন্দিরের নকশা করত। তাদের ছিল জ্যোতির্বিদ্যারও অভিনব কৌশল। গ্রিকদের মতোই তাঁরা সূর্যের দূরত্ব বের করার চেষ্টা করেন। এর জন্য প্রয়োজন ত্রিকোণমিতি। ভারতীয় সংস্করণ সম্ভবত গ্রিকদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি থেকে ধার করা।

পঞ্চম শতকের কোনো এক সময়ে ভারতীয় গণিতবিদরা সংখ্যা লেখার পদ্ধতি পাল্টে ফেলেন। গ্রিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে তাঁরা ব্যাবিলনীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তবুও ব্যাবিলনীয় পদ্ধতির সাথে একটি গুরত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। ভারতীয় সংখ্যা হলো দশ-ভিত্তিক। ব্যাবিলনীয় লিখত ষাট-ভিত্তিক সংখ্যা। আমরা এখন যেসব সংখ্যা লিখি (0, 1, …, 9 দিয়ে) এগুলোর বিকাশ ঘটেছে ভারতীয়দের ব্যবহৃত চিহ্ন থেকে। এদেরকে আরবি সংখ্যা না বলে ভারতীয় সংখ্যা বলাই যথার্থ হত।

কেউ জানে না, কখন ভারতীয়রা ব্যাবিলনীয়দের মতো স্থানীয়-মান ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করে।২ হিন্দু সংখ্যার সবচেয়ে প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় এক সিরিয় বিশপের লেখায়। ৬৬২ সালের তাঁর লেখায় দেখা যায়, কীভাবে ভারতীয় 'নয়টি চিহ্নের সাহায্যে' হিসাবনিকাশ করত। নয়টি, দশটি নয়। বোঝাই যাচ্ছে, জিরো এখানেই অনুপস্থিত। তবে নিশ্চিত করে তা বলা যাবে না। বিশপের এই লেখার আগেই হিন্দু সংখ্যার প্রচলন ছিল। ঐ সময়ের আগেই ভারতীয়রা শূন্যকে বিভিন্ন আকারে ব্যবহার করেছে তা প্রমাণিত। বিশপ হয়ত তা জানতেন না। দশ-ভিত্তিক সংখ্যায় প্লেস হোল্ডার হিসেবে চিহ্নের মাধ্যমে শূন্যের ব্যবহার নবম শতকের আগেই হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ততদিনে ভারতীয় গণিতবিদরা বিশাল মাইলফলক অর্জন করে ফেলেছেন।

গ্রিক জ্যামিতির অল্পই তারা ধার করেছিলেন। গ্রিকরা সমতল আকৃতিগুলোকে ভালবাসত। কিন্তু ভারতীয়দের এসবে আগ্রহ ছিল ছিল না। বর্গের কর্ণ মূলদ নাকি অমূলদ সংখ্যা তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। আর্কিমিডিসের মতো কনিক বা কোণের বিভাজন নিয়েও ভাবেনি। তবে সংখ্যা নিয়ে খেলতে শিখে গিয়েছিল তারা।

সংখ্যার ভারতীয় পদ্ধতি তাদের হাতে দারুণ সব অস্ত্র তুলে দেয়। এখন অ্যাবাকাসের ব্যবহার ছাড়াই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা যাচ্ছে। স্থানীয় সংখ্যা পদ্ধতির সুবাদে তারা বড় বড় সংখ্যার যোগ-বিয়োগ করতেন অবলীলায়। অনেকটা আমরা এখন যেমন পারি। একটু শিখে নিলেই যে কেউ ভারতীয় সংখ্যার সাহায্যে অ্যাবাকাসের চেয়ে দ্রুত গুণ করতে পারতেন। অ্যাবাকাসবাদী ও ভারতীয় সংখ্যার অ্যালগোরিস্টদের মধ্যে হত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর দিন শেষে জিতত অ্যালগোরিস্টরাই।

চিত্র ১৪: সংখ্যার বিবর্তন

ভারতীয় সংখ্যা যোগ ও গুণের মতো দৈনন্দিন কাজের জন্য কার্যকর হলেও এদের মূল অবদান ছিল আরও অনেক বড়। শেষ পর্যন্ত সংখ্যা জ্যামিতি থেকে আলাদা হলো। সংখ্যার কাজ আর নিছক বস্তুর পরিমাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। গ্রিকদের মতো করে ভারতীয়রা বর্গ সংখ্যার মধ্যে বর্গচিত্র কল্পনা করেনি। অথবা দেখেনি দুই সংখ্যার গুণের মধ্যে আয়তক্ষেত্রকে। তারা বরং দেখেছে দুই সংখ্যার খেলা। যে সংখ্যারা জ্যামিতিক গুরুত্ব থেকে মুক্ত। আমরা এখন যাকে অ্যালজেবরা বা বীজগণিত বলি তার জন্ম এখানেই। এ ধরনের চিন্তার কারণে অবশ্য ভারতীয়রা জ্যামিতিতে খুব বেশি অবদান রাখতে পারেননি। তবে এর ছিল আরেকটি অপ্রত্যাশিত প্রভাব। এর ফলে ভারতীয়রা গ্রিকদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হন। জিরোকে প্রত্যাখ্যান করে যে সীমাবদ্ধতায় জড়িয়েছিল গ্রিকরা।

চিত্র ১৫: অ্যালগোরিস্ট বনাম অ্যাবাকাসবাদী

ফলে সংখ্যারা জ্যামিতিক তাৎপর্য থেকে মুক্তি পেল। এবার আর যোগ-বিয়োগকে জ্যামিতিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে না। দুই একর জমি থেকে কেতে তিন একর নেওয়া যাবে না। কিন্তু দুই থেকে তিনকে বিয়োগ করতে তো কোনো বাধা নেই। এখনকার দিনে আমরা জানি: ২ – ৩ = - ১ বা মাইনাস ১। তবে প্রাচীনকালে এ ভাবনা এত সহজ ছিল না। তারা বহু সমীকরণ সমাধান করেছেন। তবে ঋণাত্মক সমাধান পেলেই ভাবতেন এই সমাধানের কোনো বাস্তব অর্থ নেই। সহজ কথা: জ্যামিত্যিকভাবে চিন্তা করলে ঋণাত্মক ক্ষেত্রফলে কীইবা অর্থ হতে পারে! গ্রিকদের কাছে তাই এটা ছিল অর্থহীন।

ভারতীয়দের কাছে ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যাপক সমাদর পেল। আসলে ভারত ও চীনেই ঋণাত্মক সংখ্যার আবির্ভাব। সপ্তম শতকের ভারতীয় গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত এক সংখ্যাকে আরেক সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার নিয়ম বানিয়েছিলেন। নিয়মের গণ্ডির মধ্যে ছিল ঋণাত্মক সংখ্যারাও। তিনি লেখেন, "ধনাত্মককে ধনাত্মক বা ঋণাত্মককে ঋণাত্মক দিয়ে ভাগ করলে ধনাত্মক আসে। ধনাত্মককে ঋণাত্মক দিয়ে ভাগ করলে ঋণাত্মক হবে। ঋণাত্মককে ধনাত্মক দিয়ে ভাগ করলেও তাই।"

এসব নিয়ম আমরা আজকাল সহজেই জানি। দুই সংখ্যাকে ভাগ দিলে ধনাত্মক হবে, যদি তাদের চিহ্ন একই হয়।

২ - ৩ যেমন একটি সংখ্যা, তেমনি ২ - ২ ও সংখ্যা। এটা হলো শূন্য। অ্যাবাকাসের শূন্যতার প্রতিনিধি হিসেবে শুধুই স্থান দখলকারী প্লেস হোল্ডার নয়। বরং সংখ্যা হিসেবে শূন্য। শুধু অবস্থান নয়, এর আছে নির্দিষ্ট মান। আছে সংখ্যারেখায় একটি নির্দিষ্ট জায়গা। শূন্য সমান ২ - ২ বলে একে (২ - ১) ও (২ – ৩) এর মাঝে স্থান দিতে হবে। মানে ১ ও (-১) এর মাঝে। আর কোনো জায়গা নেই। শূন্যকে ৯-এর পরে বসানোর সুযোগ নেই। কম্পিউটার কিবোর্ডে যদিও তা করা হয়। সংখ্যারেখায় শূন্যের আছে নিজস্ব স্থান, যা তার একান্তই নিজের। দুইকে বাদ দিয়ে যেমন সংখ্যারেখা হয় না, তেমনি হয় না শূন্যকে বাদ দিয়েও। শেষ পর্যন্ত শূন্যের আগমন ঘটেছে।

তবে ভারতীয়রাও শূন্যকে খুব অদ্ভুত সংখ্যা মনে করত। কারণও আছে। শূন্যকে যেকোনো কিছু দিয়ে গুণ করলে শূন্য আসে। যেন এটি সবাইকে শোষণ করে নেয়। আর শূন্যকে দিয়ে ভাগ করতে গেলে যেন নরক গুলজার! ব্রহ্মগুপ্ত ০ ÷ ০ ও ১ ÷ ০ এর মান বের করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি লেখেন, "সাইফারকে (শূন্য) সাইফার দিয়ে ভাগ দিলে কিছুই থাকে না।" মানে তিনি মনে করতেন শূন্যকে নিজেকে দিয়ে ভাগ দিলে শূন্য থাকে। তাঁর চিন্তা ভুল ছিল, যা আমরা পরে দেখব। ১ ÷ ০ কে তিনি কী ভাবতেন তা জানা নেই। কারণ তাঁর কিছু কথা অস্পষ্ট। আসলে তিনি হাত দোলাচ্ছিলেন আর আশা করছিলেন সমস্যা কেটে যাবে।

এ ভুল অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শেষ পর্যন্ত ভারতীয়রা বুঝলেন ১ ÷ ০ হলো অসীম। দ্বাদশ শতকের ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্কর লেখেন, “যে ভগ্নাংশের হর সাইফার, তা এক অসীম রাশি।" এর সাথে কিছু যোগ করলে কী হবে তাও বলেন তিনি, “বহু কিছু অজ্ঞ বা বিয়োগ করলেও এতে কোনো পরিবর্তন হবে না। ঠিক যেভাবে অসীম ও অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর বদলান না।"

ঈশ্বরকে পাওয়া গেল অসীমের মধ্যে। এবং শূন্যের মধ্যে।

আরবি সংখ্যা

মানুষ কি ভুলে গেছে, আমি তাকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছি?

- পবিত্র কুরআন

সপ্তম শতকে রোমের পতনের সাথে সাথে পশ্চিমও প্রভাব হারাল। তবে প্রাচ্য ক্রমেই সমৃদ্ধ হচ্ছিল। প্রাচ্যের আরেকটি সভ্যতা ভারতকে ছাড়িয়ে গেল। পশ্চিমের তারা ডুবতে ডুবতে আরেকটি তারার উদয় ঘটল। সেটা ইসলাম ধর্ম। ইসলাম শূন্যকে ভারত থেকে নিয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমও ইসলাম থেকে শূন্যকে নিয়েছিল। তবে শূন্যের রাজত্ব শুরু হয়েছিল প্রাচ্যে।

৬১০ সালের এক সন্ধ্যা। চল্লিশ বছর বয়সী মুহাম্মাদ (সা) হেরা পর্বতে ধ্যানমগ্ন। মুসলমানদের বিশ্বাস অনুসারে, জিবরাইল (আ) এসে বললেন, "পড়ুন।" মুহাম্মাদ (সা) পড়লেন। এরপর তাঁর বাণী ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো। ৬৩২ সালে তাঁর ইন্তেকাল হয়। এর এক দশকের মধ্যেই তাঁর অনুসারীরা মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য অধিকার করে। ইহুদি ও খৃষ্টানদের পবিত্র শহর জেরুজালেমের পতন হয়। ৭০০ সালের মধ্যে ইসলাম পূর্বের সিন্ধু নদী পর্যন পৌঁছে যায়। পশ্চিমে পৌঁছে আলজিয়ার্স পর্যন্ত। ৭১১ সালে মুসলমানরা স্পেন দখল করে। পৌঁছে যায় ফ্রান্স পর্যন্ত। ওদিকে প্রাচ্যে ৭৫১ সালে চীনারা পরাজিত হয়। তাদের সাম্রাজ্যে সীমানা এত বড় হয় যা খোদ আলেকজান্ডারের কাছেও অকল্পনীয় মনে হবে। চীন যাওয়ার পথে পদানত হয় ভারত। আর এখানেই আরবরা ভারতীয় সংখ্যা সম্পর্কে জানতে পারে।

মুসলমানরা অল্প দিনের মধ্যেই বিজিত এলাকার মানুষের জ্ঞান আয়ত্ত্ব করে ফেলত। পণ্ডিতরা বইপত্র আরবিতে অনুবাদ করতে লাগলেন। নবম শতকে খলিফা মামুন বাগদাদে দারুল হিকমাহ বা জ্ঞানের ঘর নামে সুবিশাল এক লাইব্রেরি গড়ে তোলেন। এটা প্রাচ্যের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন মুসা আল খাওয়ারিজমি।

খাওয়ারিজমি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। এর মদহ্যে আছে *আল জাবর ওয়াল মুকাবালা*। সাধারণ সমীকরণগুলোর সমাধান করার উপায় বলা আছে এখানে। *আজ জাবর* অর্থ *সম্পূর্ণ করা*। এখান থেকেই আমরা অ্যালজেবরা বা বীজগণিত শব্দটা পেয়েছি। হিন্দু সংখ্যাপদ্ধতি নিয়েও তিনি একটি বই লেখেন। এর ফলে আরব বিশ্বের মাধ্যমে সংখ্যার এ নতুন শৈলী ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। ছড়িয়ে পড়ল হিন্দু সংখ্যাকে দ্রত গুণ ও ভাগ করার নিয়মও (অ্যালগোরিদম)। আসলে অ্যালগোরিদম শব্দটা আল খোয়ারিজমির নাম থেকেই এসেছে। সংখ্যার প্রতীকগুলো আরবরা ভারত থেকে নিলেও বাকি বিশ্ব এদেরকে আরবি সংখ্যা নাম দিয়ে দিল।

জিরো শব্দটার মধ্যেই আছে হিন্দু ও আরবি ছোঁয়া। হিন্দু-আরবি সংখ্যা গ্রহণ করার সময় আরবরা শূন্যকেও গ্রহণ করে নেয়। জিরোর ভারতীয় নাম *শুনিয়া* বা *শূন্য*। যার অর্থ ফাঁকা। আরবরা একে বললেন *সিফর*। পশ্চিমের পণ্ডিতরা সহকর্মীদের কাছে একে পরিচিত করতে গিয়ে একে ল্যাটিন রূপ দান করলেন। ফলে *সিফর* হলো *জেফিরুস*। *জিরো* শব্দটার মূল এই *জেফিরুস*-ই। পাশ্চাত্যের অন্য গণিতবিদরা শব্দটাকে এতটা বদলাননি। এরা জিরোকে বলতেন সিফরা। এটাই পরে হলো সাইফার (cipher)। সংখ্যার নতুন গুচ্ছে জিরো এত গুরত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল যে মানুষ সব সংখ্যাকেই সাইফার বলা শুরু করল। এ থেকে আসল ফরাসি শব্দ শিফ্রে বা ডিজিট (অঙ্ক)।

তবে খাওয়ারিজমির হিন্দু সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে লেখালেখির বহু পরে পশ্চিমারা শূন্যকে গ্রহণ করতে শুরু করে। এমনকি মুসলিম বিশ্ব প্রাচ্যের ঐতিহ্য লালন করলেও এরিস্টটলের শিক্ষা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। এর কারণ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বিজয়গুলো। ওদিকে ভারতীয় গণিতবিদরা আগেই দেখিয়ে দিয়েছেন, শূন্য হলো ভয়েড বা শূন্যতার বহিঃপ্রকাশ। ফলে মুসলমানরা শূন্যকে গ্রহণ করলে এরিস্টটলকে ত্যাগ করতে হয়। তাঁরা সেটাই করলেন।

মুসা মায়মনিডিজ বারো শতকের একজন ইহুদি পণ্ডিত। তিনি আতঙ্কের সাথে মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের কথা লেখেন। তিনি দেখেন, মুসলমানরা এরিস্টটলের স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বাদ দিয়ে পরমাণুবাদীদের শরণাপন্ন হলেন। আগে থেকেই এরিস্টটলপন্থীদের সাথে পরমাণুবাদীদের বিরোধ। প্রতিকুল অবস্থায়ও তাদের মতবাদ হারিয়ে যায়নি। তাদের কথা হলো, পরমাণু নামের স্বতন্ত্র কণা দিয়ে বস্তু গঠিত। এই কণারা চলাচল করতে পারলে এদের মধ্যে থাকবে ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থান। আর তা নাহলে পরমাণুরা একে অপরের সাথে ধাক্কা খেতে থাকবে। অন্য কণার গতিপথ থেকে সরতে পারবে না।

আমি যা তাই: শূন্য

শূন্যতাই প্রাণ আর প্রাণই শূন্যতা... আমাদের সীমাবদ্ধ মন তা উপলব্ধি করতে পারে না, কারণ এটি অসীমের সাথে যুক্ত।

- আজরিয়েল

নতুন শিক্ষা, এরিস্টটলের প্রত্যাখ্যান এবং ভয়েড ও ইনফিনিটিকে গ্রহণ করে নেওয়ার প্রতীক হয়ে গেল শূন্য। ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে মুসল-মান-শাসিত অঞ্চলে শূন্য ছড়িয়ে পড়ল। সর্বত্র এর সংঘর্ষ হলো এরিস্টটলের মতবাদের সাথে। মুসলমান পণ্ডিতরাও ছেড়ে কথা বললেন না। এগারো শতকের মুসলিম দার্শনিক আবু হামিদ আল গাযালি তো ঘোষণাই দিলেন, এরিস্টটলীয় মতবাদ লালন করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। এরপরেই বিতর্কের মৃত্যু হলো।

শূন্যের এ বিতর্কে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রাচ্য থেকে আসা ইসলাম একটি সেমেটিক ধর্ম। মুসলমানদের বিশ্বাস, আলাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ভয়েড বা শূন্য থেকে। ওদিকে ভয়েড ও ইনফিনিটির প্রতি এরিস্টটলের রয়েছে সীমাহীন ঘৃণা। ফলে এরিস্টটলের মতবাদ যেখানেই থাকবে সেখানে শূন্য থেকে সৃষ্টির মতবাদ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আরব ভূমিতে শূন্য ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানরা একে সাদরে গ্রহণ করল। আর ছুঁড়ে ফেলে দিল এরিস্টটলকে। এ দলে পরে যোগ দিল ইহুদিরা।

হাজার বছর ধরে ইহুদিদের জীবনযাত্রার কেন্দ্র ছিল মধ্যপ্রাচ্য। দশম শতকে স্পেন তাদের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিল। খলিদা তৃতীয়াব্দুর রহমানের এক ইহুদি মন্ত্রী ছিল। তিনি ব্যাবিলন থেকে বহু বুদ্ধিজীবিকে নিয়ে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিপুলসংখ্যক ইহুদি জনগোষ্ঠী স্পেনে বেড়ে উঠল।

স্পেন ও ব্যাবিলন দুই জায়গাতেই মধ্যযুগের শুরুর দিকের ইহুদিরা এরিস্টটলের মতবাদ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। খৃষ্টানদের মতোই তারা অসীম ও ভয়েডকে মেনে নেননি। তবে ইসলামী শিক্ষার মতোই ইহুদি ধর্মতত্ত্বের সাথেও এরিস্টটলের দর্শনের বিরোধ ছিল। এ কারণেই বারো শতকের ইহুদি রাব্বি বিশাল এক পুস্তক রচনা করেন। উদ্দেশ্য হলো প্রাচ্যের সেমেটিক বাইবেলের সাথে পাশ্চাত্যের গ্রিক দর্শনের বিরোধ দূর করা।

মায়মনিডিজ শূন্যকে প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ শেখেন এরিস্টটলের কাছ থেকে। গ্রিক যুক্তিকে তিনি এবার নতুন রূপ দান করলেন। পৃথিবীর চারপাশের ফাঁপা গোলকদের কিছু একটা নাড়াচ্ছে। হয়তো বা পরের গোলকটি তা করছে। তাহলে পরের গোলককে কে নাড়াচ্ছে? অবশ্যই তার পরের গোলক। কিন্তু অসীম গোলক তো থাকা সম্ভব নয়, কারণ অসীম অসম্ভব। তার মানে সর্বশেষ গোলক কেউ একজন নাড়াচ্ছে। এটাই হলো পরম চালক ঈশ্বর।

মায়মনিডিজের যুক্তি আসলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটি প্রমাণ। ধর্মতত্ত্বে এটি অনেক মূল্যবান। তবে একইসাথে বাইবেল ও অন্যান্য সেমেটিক সংস্কৃতিতে অসীম ও ভয়েডের প্রচুর উদাহরণ আছে। মুসলমানরা এর মধ্যেই সেগুলোকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। ৮০০ বছর আগের সেন্ট অগাস্টিনের মতো মায়মনিডিজও সেমেটিক বাইবেলকে নতুন রূপ দিয়ে গ্রিক মতবাদের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। যে মতবাদ কোনো কারণ ছাড়াই ভয়েডকে ভয় পায়। প্রথম যুগের খ্রিষ্টানরা গ্রিকদের মতবাদের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টকে রূপক বলতেন। তবে মায়মিনিডিজ নিজের ধর্মকে পুরোপুরি গ্রিক আদলে ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ধর্মীয় ঐতিহ্যগত কারণে তিনি বাইবেলের শূন্য থেকে সৃষ্টির বিবরণ মেনে নিতে বাধ্য। আর এর সহজ অর্থ হলো এরিস্টটলের বিপক্ষে যাওয়া।

এরিস্টটল বলেছিলেন, মহাবিশ্বের অস্তিত্ব সবসময় ছিল। মায়মনিডিজ বললেন, এ যুক্তির প্রমাণে ভুল আছে। ধর্মগ্রন্থের সাথেই তো বিরোধ এর! ফলে এরিস্টটলের মতবাদকে বিদায় নিতেই হবে। মায়মনিডিজ বললেন, সৃষ্টির সূচনা হয়েছে শূন্য থেকে। এ বিষয়ে একটি প্রচলিত কথা হলো *ক্রিয়েশিও এক্স নিহিলো*। যার অর্থ বস্তুর সৃষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টিশীল কাজের ফল। এরিস্টটল যতই ভ্যাকুয়ামকে নিষিদ্ধ করে গিয়ে থাকেন তাতে কিছু আসে যায় না। এর মাধ্যমে ভয়েড বা শূন্যতার অধর্ম থেকে পবিত্রতায় রূপান্তর ঘটল।

ইহুদিদের জন্য মায়মনিডিজের পরবর্তী সময়টা হলো শূন্যের যুগ। তেরো শতকে নতুন আরেক মতবাদের প্রসার হলো। এর নাম কাবালিজম বা ইহুদি মরমিবাদ। কাবালীয় চিন্তার কেন্দ্রীয় একটি বিষয় হলো গামেত্রিয়া। ব্যাপারটা হলো বাইবেলের লেখার মধ্যে সাঙ্কেতিক বার্তা অনুসন্ধান। গ্রিকদের মতো হিব্রুরাও বর্ণমালার অক্ষর দিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করত। অতএব সব শব্দের আছে সাংখ্যিক মান। এর মাধ্যমে শব্দের লুকানো অর্থ বোঝা যেত। যেমন উপসাগরীয় যুদ্ধের (Gulf war) অংশগ্রহণকারীরা জানত সাদ্দাম শব্দের মান: সামেক (৬০) + আলেফ (১) + দালেদ (৪) + আলেফ (১) + মেম (৬০০)। মোট ৬৬৬। যে সংখ্যাকে খ্রিষ্টানরা অশুভ প্রাণীর সংখ্যা মনে করে। যে প্রাণী মহাপ্রলয়ের সময় আবির্ভূত হবে। সাদ্দাম শব্দে একটা নাকি দুটি দালেদ অক্ষর হবে তা নিয়ে কাবালীদের চিন্তা নেই। যোগফল মিলিয়ে দিতে তারা শব্দের বানান এদিক-সেদিক করে নেয়। কাবালীয়দের বিশ্বাস, একই মানের শব্দ ও শব্দগুচ্ছের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক আছে। যেমন বাইবেলের জেনেসিস পুস্তকের ৪৯:১০ অনুচ্ছেদ বলছে, "রাজদণ্ড জুডাহর কাছ থেকে সরবে না, ... যতদিন না শিলহ আসে।" হিব্রু ভাষায় "যতদিন না শিলহ আসে" কথাটার মান ৩৫৮। হিব্রুতে মাসায়াহ বা মসীহ শব্দের মানও একই। অতএব এ অনুচ্ছেদ মসীহর আগমনের পূর্বাভাস দিচ্ছে। কিছু সংখ্যাকে পবিত্র বা অশুভ মনে করা হত। এসব সংখ্যা কাবালীয়রা বাইবেলে খুঁজত। অনুসন্ধান করে দেখত কোনো গুপ্ত বার্তা পায় কিনা। সাম্প্রতিক বেস্টসেলার বই *দ্য বাইবেল কোড* এ পদ্ধতিতে পূর্বাভাস দেখাতে চেয়েছে।

কাবালাহ জিনিসটা নিছক সংখ্যার খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ সংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ছিল প্রকট। যে কারণে অনেক পণ্ডিত মনে করেন, এর সাথে হিন্দু ধর্মের দারুণ মিল রয়েছে। এই যেমন কাবালাহ মতবাদে ঈশ্বরের দ্বৈত প্রকৃতির ধারণার ব্যবহার আছে। হিব্রু কথা *আইন সফ* অর্থ অসীম। এটা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টির দিক বোঝানো হয়। ঈশ্বরের যে দিক মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। মহাবিশ্বের প্রতিটি আনাচে-কানাচে রয়েছে যার প্রভাব। একইসাথে এর আছে আরেকটি নাম: *আইন* (ayin) বা শূন্যতা। অসীম ও ভয়েড একাকার। দুটিই ঈশ্বরের অংশ। আরও চমকপ্রত ব্যাপার আছে। আইন শব্দের অক্ষরগুলোকে ঘুরিয়ে লিখলে (অ্যানাগ্রাম) হয় আনই (aniy)। হিব্রুতে যার অর্থ "আমি"। এর চেয়ে সহজ করে আর কীভাবে বার্তা দেওয়া যায়: "আমি কিছুই না,” আবার "আমি অসীম।"

একদিকে ইহুদিরা প্রাচ্যের বাইবেলের জন্য পশ্চিমের সংবেদনশীলতাকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। ওদিকে একই লড়াই চলছে খৃষ্টান সমাজে। একদিকে তারা মুসলমানদের সাথে লড়াই করেছে। নবম শতকে শার্লেমেনের শাসনামলে লড়াই হয়েছে। ক্রুসেড কয়েছে এগারো, বারো ও তেরো শতকে। তবে এসব লড়াইয়ের সময় যোদ্ধা, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত ও বণিকরা ইসলামী ধারণাগুলোও পশ্চিমে নিয়ে গেছে। সন্ন্যাসীরা দেখল আরবদের নক্ষত্রের উন্নতি মাপার যন্ত্র অ্যাস্ট্রোলেইব। আরবদের উদ্ভাবিত এ যন্ত্র সন্ধ্যায় সময়ের হিসাব রাখতে দারুণ কাজে আসে। ফলে সময়মত নামাজ পড়া যায়। যন্ত্রটিতে বেশিরভাগ সময় আরবি সংখ্যা লেখা হত।

নতুন সংখ্যা তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। যদিও দশম শতকের পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার এগুলো দেখে মুগ্ধ হন। সম্ভবত এক ভ্রমণে স্পেন গিয়ে তিনি সংখ্যাগুলো দেখেন। ইতালিতে ফিরে আসার সময় নিয়ে আসে সঙ্গে করে। তবে তার এ সংস্করণে শূন্য ছিল না। থাকলে সেটা জনপিয়তা পেট আরও কম। গির্জায় তখনও এরিস্টটলের তীব্র প্রভাব। গির্জার সেরা চিন্তাবিদরা তখনও অসীম পরিমাণ বড় বা ছোট বস্তু ও ভয়েডকে মেনে নেননি। তেরো শতকে অবশ্য ক্রুসেডাররা এ ধারণাগুলোর কাছাকাছি গিয়েছিল। তবুও সেন্ট থমাস অ্যাকুইনাস ঘোষণা দেন, ঈশ্বর কোনো পণ্ডিত ঘোড়া যেমন বানাবেন না, ত্মেওনি অসীম আকারের বড় কিছুও বানাবেন না। কিন্তু এরই আবার অর্থ দাঁড়ায়, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নন। খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে সেও এক নিষিদ্ধ চিন্তা।

১২৭৭ সালে ফ্রান্সের বিশপ এটিঁয়ে টেম্পিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের এক সভা ডাকেন। উদ্দেশ্য এরিস্টটলীয় মতবাদের আলোচনা। আরও সঠিক করে বললে এ মতবাদকে আক্রমণ করতে। ঈশ্বরের সর্বশক্তির গুণের বিপরীত অনেকগুলো এরিস্টটলীয় বক্তব্য টেম্পিয়ে বাতিল করেন। এমন একটি কথা হলো, "ঈশ্বর আকাশকে সরলরেখা বরাবর সরাতে পারবেন না, কারণ সেক্ষেত্রে পেছনে একটি ভ্যাকুয়াম তৈরি হবে।" (ঘূর্ণায়মান গোলকের এ অসুবিধা নেই, কারণ ঘুরলেও গোলক একই স্থান দখল করে থাকে। গোলককে নাড়িয়ে আকাশের নতুন স্থানে নিয়ে গেলে আগের জায়গায় কিছু থাকবে না। শুধু সেক্ষেত্রেই ভ্যাকুয়াম তৈরি হবে।) আসলে ঈশ্বর চাইলেই ভ্যাকুয়াম তৈরি করতে পারেন। ফলে হঠাৎ করেই ভয়েড আলোচনার টেবিলে আসার অনুমতি পেল। কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এরিস্টটলের বানানো নিয়ম বাধ্য নন।

তবে টেম্পিয়ের ঘোষণাতেই এরিস্টটলের দর্শনের মৃত্যু হয়নি। তবে নিশ্চিতভাবেই সেটা ছিল উত্তর আকাশের কালো মেঘ। আরও কয়েক শ বছর গির্জা এরিস্টটলের মতবাদ আঁকড়ে ধরেছিল। তবে এরিস্টটলের পতন এবং ভয়েড ও ইনফিনিটির উত্থান শুরু হয়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্যে শূন্যের আগমনের জন্য এর চেয়ে অনুকূল পরিবেশ আর হয় না। বারো শতকের মাঝামাঝির সময়ের কথা। আল-খাওয়ারিজমির *আলজাবর* বইয়ের প্রথম রূপান্তরগুলো স্পেন ও ইংল্যান্ড হয়ে ইউরোপের বাকি অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছিল। শূন্য আগেই রওয়ানা দিয়েছিল। গির্জা এরিস্টটলের শিকল ভেঙে দিতে দিতে শূন্য এসে পৌঁছে গেল।

শূন্যের বিজয়

... শূন্য একটি ব্যাপক ও গুরত্বপূর্ণ ধারণা। আমরা একে সরল ভাবি, কারণ এর আসল /////গুণ///// আমরা খেয়াল করি না। তবে হিসাব-নিকাশের মধ্যে ক্ষেত্রে এই সহজ-সরল গুণটির কারণেই প্রয়োজনীয় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গণিত সেরাদের কাতারে স্থান পেয়েছিল।

-পিয়েরে সিমোঁ লাপ্লাস

খৃষ্টানরা শুরতে শূন্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তবে বাণিজ্যিক কারণে অল্পদিনের মধ্যেই এর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। পিসার লিওনার্দো শূন্যকে পুনরায় পশ্চিমে নিয়ে আসেন। ইতালীয় বণিকের এই ছেলেটি উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণ করেছিলেন। লিওনার্দো না বলে ফিবোনাচি বললে মানুষ তাঁকে সহজে চেনে। তিনি মুসলমানদের কাছে গণিত শেখেন। অল্পদিনের মাথায় নিজেই ভালো গণিতবিদ হয়ে ওঠেন।

তাঁর লইবের আবাসি বইয়ের একটি ছোট ও সামান্য গাণিতিক সমস্যার জন্যই তিনি সবচেয়ে পরিচিতি পান। বইটি ১২০২ সালে প্রকাশিত হয়। ধরুন একজন কৃষকের এক জোড়া বাচ্চা খরগোশ আছে। বয়স্ক হতে বাচ্চা খরগোশের দুই মাস সময় লাগে। এরপর থেকে তারা প্রতি মাসে এক জোড়া করে বাচ্চা জন্ম দিতে থাকে। বাচ্চারাও বয়স্ক হলে আবার বাচ্চা দিতে থাকে। এভাবেই চলতে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, নির্দিষ্ট একটি মাসে কয় জোড়া খরগোশ দেখা যাবে?

দেখা যাক। প্রথম মাসে থাকবে **এক জোড়া খরগোশ**। বয়স্ক না হওয়ায় এরা সন্তান জন্ম দেবে না।

দ্বিতীয় মাসেও **এক জোড়াই** থাকবে।

তৃতীয় মাসে খরগোশের জোড়াটি সন্তান উৎপাদন করেছে। এখন খরগোশ আছে **দুই জোড়া**।

চতুর্থ মাসের শুরুতে প্রথম জোড়াটি আবার সন্তান জন্ম দিয়েছে। তবে দ্বিতীয় জোড়া এখনও বয়স্ক হয়নি। ফলে এখন খরগোশ আছে **তিন জোড়া**।

পরের মাসে প্রথম জোড়াটি আবারও এক জোড়া খরগোশ উপহার দিয়েছে। দ্বিতীয় জোড়াও বয়স্ক হয়ে সন্তান পেয়ে গেছে। তবে তৃতীয় জোড়া এখনও বয়স্ক হয়নি। তাহলে সবমিলিয়ে খরগোশ এখন **পাঁচ জোড়া**।

এভাবে চলতে থাকলে খরগোশের জোড়ার সংখ্যা বিভিন্ন মাসে এরকম হবে: ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ...। কোনো নির্দিষ্ট মাসের খরগোশের সংখ্যা পেতে হলে আগের সব মাসের খরগোশের সংখ্যাগুলো যোগ করতে হবে। গণিতবিদরা মুহূর্তেই এই ধারার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। যেকোনো সংখ্যা নিয়ে একে তার আগের সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিন। যেমন ৮/৫ = ১.৬। ১৩/৮ = ১.৬২৫। ২১/১৩ = ১.৬১৫৩৮...। অনুপাতগুলো একটি দারুণ সংখ্যার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর নাম সোনালী অনুপাত (Golden ratio)। যার মান ১.৬১৮০৩...।

পিথাগোরাস খেয়াল করেছিলেন, প্রকৃতি সম্ভবত সোনালী অনুপাত দ্বারা চালিত হচ্ছে। ফিবোনাচি এর পেছনের নিয়ামক ধারাটি আবিষ্কার করলেন। শামুকের খোলসের আকার মেনে চলে এ ধারা। মেনে চলে আনারসের ডানাবর্তী ও বামাবর্তী খাঁজগুলো। এ কারণেই প্রকৃতির এ জিনিসগুলো সোনালী অনুপাতের কাছাকাছি যেতে থাকে।

এই ধারার জন্যই ফিবোনাচি সবচেয়ে বেহসি খ্যাতি পেয়েছেন। তবে তাঁর *লিবের আবাসি* পশুখামারের চেয়ে বড় উদ্দেশ্য বহন করে। ফিবোনাচি গণিত শিখেছিলেন মুসলমানদের কাছে। ফলে তিনি আরবি সংখ্যা সম্পর্কে জানতেন। জানতেন শূন্যের কথাও। এই নতুন পদ্ধতি তিনি তাঁর *লিবের আবাসি* বইয়ে উল্লেখ করেন। ইউরোপ শেষ পর্যন্ত জানল শূন্যের কথা। বইয়ে তিনি জটিল হিসাব করার ক্ষেত্রে আরবি সংখ্যার চমৎকার দিকটি তুলে ধরেন। ইতালীয় বণিক ও ব্যাংকাররা দ্রুতই নতুন পদ্ধতিটার সুবিধা গ্রহণ করলেন। সাথে নিলেন শূন্যকেও।

আরবি সংখ্যা আসার আগে ব্যাংকের কাউন্টারের লোকেরা অ্যাবাকাস বা কাউন্টিং বোর্ড ব্যবহার করতেন। জার্মানরা কাউন্টিং বোর্ডকে বলত রেশেনব্যাংক। এজন্যই আমরা ঋণদাতাদের ব্যাংক বলি। সেসময় ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল খুবই আদিম। ঋণের হিসাব রাখতে কাউন্টিং বোর্ডের পাশাপাশি ব্যবহার ছিল ট্যালী স্টিকের। স্টিকের এক পাশে অর্থের পরিমাণ লেখা হত। এরপর একে দুই ভাগ করা হত (চিত্র ১৬)। ঋণদাতাই রাখত দুই খণ্ডের বড় অংশটি। এর নাম স্টক। আর দাতাকে বলা হত স্টকহোল্ডার।৪

চিত্র ১৬: ট্যালি স্টিক

আরবি সংখ্যা ইতালীয় বণিকদের মন জয় করে নেয়। ব্যাংকাররা কাউন্টিং বোর্ড থেকে মুক্তি পেলেন। ব্যবসায়ীরা এ সংখ্যার উপকার টের পেলেও স্থানীয় সরকার এদের ঘৃণার চোখে দেখল। ১২৯৯ সালে ফ্লোরেন্সে আরবি সংখ্যা নিষিদ্ধ হয়। আপাতদৃষ্টিতে এর কারণ ছিল আরবি সংখ্যাকে সহজেই পাল্টে ফেলা যায় ও ভুল সংখ্যা দেখানো যায়। (যেমন আরবি ০-কে কলমের খোঁচায় সহজেই ৬ বানিয়ে ফেলা যায়।) তবে শূন্য এবং অন্যান্য আরবি সংখ্যার সুবিধাটুকু অত সহজেই উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। ইতালীয় বণিকরা এগুলোর ব্যবহার ছাড়েননি। তারপর এগুলো দিয়ে পাঠাতেন সাঙ্কেতিক বার্তাও। আর এ কারণেই *সাইফার* (cipher) শব্দের অর্থ হয়েছে গুপ্ত সঙ্কেত।

শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যিক চপাএর কাছে সরকারকে নত হতে হয়। ইতালিতে আরবি প্রতীক অনুমোদন পায়। ক্রমেই তা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপজুড়ে। পৌঁছে গেছে শূন্য। এবং ভয়েড। মুসলমান ও হিন্দুদের প্রভাবে এরিস্টটলের দূর্গ ভেঙে যাচ্ছিল। চতুর্দশ শতকের শুরতেই ইউরোপে এরিস্টটলীয় মতবাদের জাঁদরেল সমর্থকও এ মতবাদকে সন্দেহের চোখে দেখত। ক্যান্টারবেরির সে সময়ের পরবর্তী আর্চবিশপ থমাস ব্র্যাডওয়ার্ডিন এরিস্টটলীয় মতের পুরনো শত্রু পরমাণুবাদকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা চালান। একইসাথে তিনি এও ভাবেন, নিজের যুক্তিটি ঠিক আছে তো! কারণও আছে। তাঁর যুক্তির ভিত্তি ছিল জ্যামিতি। যার অসীমসংখ্যক বার বিভাজনযোগ্য রেখা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পরমাণুবাদকে বাতিল করে দেয়। তবে এরিস্টটল তখনও পরাজয় থেকে অনেক দূরে।

নোট

১। এখানে উল্লেখিত তথ্য সব মতের মানুষের ধারণার সাথে মিলবে না। প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে।

২। স্থানীয় মানের উদাহরণ: ১২ সংখ্যাটিতে দুটি অঙ্ক ১ ও ২। ২-এর স্থানীয় মান ১ ও ১-এর মান ১০। এভাবে ৪৩২-এর ক্ষেত্রে ২-এর ১, ৩-এর ১০ ও ৪-এর ১০০। স্থানীয় মান দিয়ে সব সংখ্যার মান বের করা যায়। যেমন ৪৩২ = ৪ × ১০০ + ৩ × ১০ + ২ × ১ = ৪০০ + ৩০ + ২ = ৪৩২।

৩। ইহুদি, খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্মকে একসঙ্গে সেমেটিক ধর্ম বলে।

৪। স্টিকের ব্যবহার করতে ঝামেলার অন্ত ছিল না। ইংরেজ অর্থমন্ত্রনালয় ১৮২৬ সাল পর্যন্ত এক ধরনের ট্যালি স্টিকে হিসাব রাখত। চার্লস ডিকেন্স প্রাচীন এ পদ্ধতির পরিণাম সম্পর্কে বলেন, “১৮৩৪ সালে দেখা যায়, অনেক স্টিক জমা হয়ে গেছে। প্রশ্ন দাঁড়াল, ক্ষয়ে যাওয়া, পোকায় খাওয়া ও পুরনো এসব স্টিককে কী করা হবে? এগুলো রাখা ছিল ওয়েস্টমিনিস্টারে। যেকোনো বুদ্ধিমান মানুষ বুঝবেন, এগুলোকে লাকড়ি হিসেবে ব্যবহার করাই সবচেয়ে সহজ হবে। পাশের পাড়ার কোনো গরিব মানুষকে তা দিয়ে দিলেই হলো। তবে এগুলো কোনো কাজেই আসেনি। সরাকারি আইন বলছে, এগুলো ব্যবহারই করা যাবে না। তাই, নির্দেশ এল, এগুলোকে গোপনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের সংসদের উচ্চকক্ষ হাউস অব লর্ডসের চুলায় এগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পুরনো স্টিকে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। আগুন ধরে যায় দেয়াল ও ছাদে। সে আগুন চলে যায় হাউস অব কমন্স (নিম্নকক্ষ) পর্যন্ত। দুই হাউসই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুনঃনির্মাণের জন্য স্থপতি ডেকে আনা হয়। আর তার খরচ বর্তমানে বিশ লাখ পেরিয়ে গেছে।